সার্টিফিকেট

সুব্রত রায়

লালুদা জানলা দিয়ে আমাদের দেখতে পেয়ে বললেন - কি ব্যাপার, গত রোববার সব কোথায় ছিলে? কাউকে দেখতে পাইনি কেন? ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বাবলু বললো - গত রোববার আমরা ভোরবেলায় জৌগ্রাম গিয়েছিলাম। লালুদা বললেন - জৌগ্রাম? হঠাৎ? বাবলু বললো - অমিতের রুণা মাসির জৌগ্রামে বিরাট বাড়ি আছে। প্রত্যেক বছর শীতের সুরুতে আমরা একদিন জৌগ্রামে কাটিয়ে আসি। অমিত বললো - মাসির বেশ বড়ো দোতলা বাড়ি। বাড়ির চারপাশে অনেক জায়গা। বিরাট পুকুর। তাতে প্রচুর মাছ। মাসি খুব বড়োলোক। শোনা যায় শীতের সুরুতে মাসি ছাতে টাকা রোদ্দুরে দেয়। বর্ষার সময় নাকি টাকায় ছাতা পড়ে যায়। মাসি ছাতে কাউকে উঠতে দেয় না। দুটো কুকুর ছেড়ে রাখে। বাবলু যোগ করলো - মাসি দারুণ খাইয়েছে। তবে শুধু মদন ময়রার রসগোল্লা খাবার জন্য জৌগ্রাম যাওয়া যায়। লালুদা আস্তে আস্তে বললেন - অমিত, বাড়ির ভিতর গিয়ে তোমার বৌদিকে মুখটা দেখিয়ে এসো। বৌদি ভিতর থেকে বললেন - মুখ দেখালেও এখন চা হবে না। বরাট আসুক, একবারে চা বানাবো। লালুদা বললেন - আজ তোমরা তিনজন কেন? দীপ কোথায়? বলতে বলতে দীপ দরজা দিয়ে ঢুকতে ঢুকতে বললো - কেলেঙ্কারিয়াস কাণ্ড। ডাক্তারবাবু বিষ্টুদাকে শুধু মারতে বাকি রেখেছেন। লালুদা বললেন - আহা, একটু শান্ত হয়ে বসে জিরিয়ে নিয়ে বলো না কি হয়েছে। ঘরের কোণে রাখা কুঁজোটা মাথার উপর তুলে দীপ ঢক ঢক করে বেশ খানিকটা জল খেয়ে চেয়ারে বসলো। বুঝলেন লালুদা, আজ না বরাট ডা - দরজা দিয়ে বরাটকে ঢুকতে দেখে দীপ থেমে গেল। ছি ছি, এমন বোকা আমাকে জীবনে কেউ বানায় নি - চেয়ারে বসতে বসতে বরাট বললো। লালুদা বললেন - আরে বরাট বসো বসো। কি হয়েছে বলবে তো? বরাট বললো - এতদিন ডাক্তারি করছি। কোনো পেশেন্ট এমনভাবে আমাকে বুদ্ধু বানায় নি। লালুদা বললেন - ব্যাপারটি কি বলবে তো। তখন থেকে খালি ছি ছি শুনছি। ভেতর থেকে বৌদি বললেন - বরাট একটু জোরে জোরে বলো। আমি যেন এখান থেকে শুনতে পাই। বরাটের ছি ছি বলা থেমেছে। এবার সুরু করলো। মাস আটেক আগেকার কথা। পিন্টু একদিন কান্তি খুড়োকে নিয়ে আমার চেম্বারে হাজির। পিন্টু স্কুলে আমার চেয়ে পাঁচ ক্লাস নিচে পড়তো। লালুদা বললেন - কোন কান্তি খুড়ো? নারকেল বাগানের? বরাট বললো - হ্যাঁ। খুড়োকে দেখেই বুঝলাম সুগার বেড়েছে। স্পট টেস্ট করে দেখলাম ৩৫০। পিন্টুকে বললাম - কাল রক্ত পরীক্ষা করে রিপোর্টগুলি নিয়ে বিকালে আমার সঙ্গে দেখা করবি। বিকেলে রিপোর্ট দেখলাম। যা ভেবেছি তাই। ফাস্টিং ১৭০ পিপি ৩৯০। পিন্টুকে বললাম, তোর বাবাকে নজরে রাখতে হবে। খুড়ো সকালবেলায় ব্রেকফাস্ট করে বাড়ি থেকে বের হয়ে এ দোকানে ও দোকানে খেয়ে বেড়ান। এটা বন্ধ করতে হবে। বাড়ি থেকে বের হওয়া একদম বন্ধ। সকালে বিকেলে ছাদে হাঁটবে। ও হ্যাঁ, তোর বউকে সেদিন বাজারে দেখলাম। বেশ মুটিয়ে গেছে। ওকেও বলবি খুড়োর সঙ্গে হাঁটতে। একটু কড়া

ওষুধ দিচ্ছি। সুগার ঝপ করে নেমে যেতে পারে। বাড়িতে গ্লুকোজ রাখবি। যদি হঠাৎ ঘাম হয় কিম্বা কথা জড়িয়ে যায় তাহলে গ্লুকোজ খাইয়ে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আমাকে খবর দিবি। তিন সপ্তাহ পর ব্লাড টেস্ট করে রিপোর্ট দেখিয়ে যাবি। এইভাবে সব ঠিক চলছিলো। সুগার নর্মাল হয়ে গেছে। ওষুধ অনেক কমিয়ে দিয়েছি। একদিন খুড়ো আমার কাছে কেঁদে পড়লো। ডাক্তার আটমাস আমাকে বাড়িতে বন্দি করে রেখেছো। আমার দুই বৌমা রান্নাঘর আর ফ্রিজ তালা বন্ধ করে ট্যাঁকে চাবি গুঁজে রাখে। আমার ছোটো বৌমার বাবা আবার দারোগা। ছোটোবেলা থেকে পুলিস দেখতে দেখতে ছোটো বৌমার হাবভাব পুলিসের মতন। তুমি এক কাপ চায়ে সিকি চামচ চিনি দিতে বলেছিলে। ছোটো বৌমা ফতেয়া দিলো চিনি একদম বন্ধ। খুড়ো খেতে খুব ভালবাসে। খুড়োকে তার কম বয়সে দেখিনি। আমার বৌভাতে সব খাওয়ার পর খুড়ো ছত্রিশটা লেডিকেনি খেয়েছিলো। তখন খুড়োর বয়স পঞ্চাশ। এই সব ভেবে আমার একটু দয়া হলো। সুগার নর্মাল, সপ্তাহে একদিন একটা রসগোল্লা খাওয়া যেতে পারে। আমি বললাম, ঠিক আছে রোববার সকালে বেরিয়ে বিষ্টুর দোকানে গিয়ে একটা রসগোল্লা খেয়ে আসবে। আমি বিষ্টুকে বলে দেবো। কিন্তু অন্য কোনো দোকানে খেতে ঢুকলে খুব খারাপ হবে। খুড়ো জিব কেটে বললো, আমি কখনও তোমার কথা অমান্য করেছি? সপ্তাহ দুয়েক পরে খবর পেলাম বিষ্টুর দোকানের লাগোয়া খাবার জায়গায় যে চারটে কেবিন আছে তার মধ্যে একটায় বসে খুড়ো খাচ্ছে। কেবিনটা এইসব ছেলে ছোকরাদের গার্ল ফ্রেন্ডদের নিয়ে বসার জন্য। খুড়ো কেন কেবিনে বসে খাবে? আমি হেবোকে বললাম, তুই রোববার সকালে বিষ্টুর দোকানের সামনে ঘোরাফেরা করবি। খুড়ো দোকানে ঢুকলেই আমাকে খবর দিবি। আমি বিষ্টুর দোকানের উল্টোদিকে একটা বাড়িতে থাকবো। সাড়ে নটা নাগাদ হেবো ফুটপাত থেকে আমাকে ইশারা করলো। আমি কেবিনের মধ্যে ঢুকে দেখলাম খুড়োর চোখ চকচক করছে। জিব দিয়ে ঠোট চাটছে। সামনে একটা রাজভোগ, তার সাইজ মোটামুটি একটা ক্রিকেট বলের মতো। খুড়ো সবে হাত বার করেছিলো রাজভোগটা তোলার জন্য। আমাকে দেখে তড়াক করে উঠে দাঁড়ালো। আমি বললাম, খুড়ো কাগজে দেখছি হরভজন সিংকে দিল্লি টেস্টে বসিয়ে দিয়েছে। তুমি কি এই বলটা দিয়ে অফব্রেক দেওয়া প্রাকটিস করছো ইডেনে টেস্ট খেলার জন্য? খুড়ো তোতলাতে লাগলো, আ... আ... মা... মা...। আমি বললাম, থাক আর মানে মানে করতে হবে না। চেঁচিয়ে ডাকলাম বিষ্টু। বিষ্টু ক্যাশ-এ বসে ছিলো। দাঁত বের করতে করতে আমার সামনে এসে বললো, বলুন ডাক্তারবাবু। আমি রাজভোগের দিকে তাকিয়ে বললাম, এটা কি? বিষ্টু বললো, খুড়ো সপ্তাহে একটা বড়ো করে রাজভোগ বানিয়ে দিতে বলেছেন। তাই-ই। আমি বললাম, তাই-ই না? তোমাকে একটা পাঁচটাকা দামের রসগোল্লা দিতে বলেছিলাম না? পাশ থেকে গণেশ বললো, ওটার দাম পাঁচটাকা ডাক্তারবাবু। আমি বললাম, পাঁচটাকা? চালাকি হচ্ছে? গণেশ বললো, সত্যি ডাক্তারবাবু ওটার দাম পাঁচটাকা। তবে কেবিন চার্জ চার টাকা। সার্ভিস চার্জ তিন টাকা। আর ..। আমি গণেশকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, থাক থাক বুঝেছি। সব চার্জ যোগ করে মোট কত? গণেশ বললো, একুশ টাকা। তবে আমরা কন্সেশন করে খুড়োর জন্য কুড়ি টাকা দাম ধরেছি। এবার আমি বিষ্টুর দিকে তাকিয়ে বললাম, খুড়ো যদি

অক্কা পায় তাহলে আমি তোমার বিরুদ্ধে পিনাল কোডের ৩০৪ ধারায় অনিচ্ছাকৃত নরহত্যার অভিযোগ আনবো। তাতে কত বছরের জেল হতে পারে জানো? বিষ্টু বললো, রাজভোগ বানাবার জন্য জেল? আমি বললাম, কেন নয়? তুমি যদি এই রাজভোগ ছুঁড়ে কাউকে মারো, আর সে যদি মরে যায় তাহলে ৩০২ ধারায় ইচ্ছাকৃত নরহত্যার জন্য তোমার ফাঁসি পর্যন্ত হতে পারে। আমি মাথা তুলে দেখলাম কোনের রান্নাঘরে হরিপদ কচুরি ভাজছে। এক একবারে পনেরো কুড়িটা করে কচুরি ঝাঁজরি দিয়ে তুলছে। হরিপদকে বললাম, তোমার হাতা নেই। হরিপদ একটা হাতা তুলে দেখালো। আমি বললাম, কড়াই থেকে এক হাতা তেল নিয়ে এদিকে এসো তো? বিষ্টু বললো, তেল দিয়ে কি হবে? আমি বললাম, তোমার মাথায় ঢালবো। বিষ্টু কাঁদো কাঁদো হয়ে বললো, ওটা তো গরম তেল, মাথায় ঢাললে মরে যাবো। আমি বললাম, মরবে না। একটু পুড়ে যাবে এই যা। বিষ্টুর মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। একেবারে ফুটবল গোলকিপারের মতো ডাইভ দিয়ে আমার পায়ে পড়ে বললো - ডাক্তারবাবু এবারের মতো ছেড়ে দিন। আর কখনো এমন হবে না। আমি বললাম - ক-দিন আগে আই-লিগে মোহনবাগান পাঁচ গোল খেয়েছে। ডাইভটা তো দারুণ দিলে। ময়দানে গিয়ে মোহনবাগানের কোচের সঙ্গে দেখা করে খোঁজ নিতে পারো তোমার কোনো চান্স আছে কিনা। বিষ্টু বলতে লাগলো, এ বারের মতো ছেড়ে দিন। ততক্ষণে দোকানের বাইরে অনেক লোক জড়ো হয়ে গেছে। আমি বিষ্টুকে বললাম, বাইরে এসো। বাইরে দেখি ভিড়ের মধ্যে এই দীপ ছোকরা দাঁড়িয়ে আছে। আমি দীপকে বললাম, এই ছোকরা তোর বেল্টটা দে। ছোকরা বলে কি, আমার প্যান্ট খুব ঢিলে। বেল্ট খুললে প্যান্ট একদম পায়ের কাছে নেবে যাবে। আমি ধমক দিয়ে বললাম, কোমরের কাছে মুঠো করে প্যান্ট ধরে দাঁড়িয়ে থাক। বিষ্টুকে বললাম, হাতে, পায়ে না পিঠে কোথায় মারবো? বিষ্টু বললো - বেল্ট দিয়ে মারলে ভীষণ লাগে। তাই নাকি। কি করে জানলে, আমি বললাম। বিষ্টু বললো - ক্লাস নাইনের অ্যানুয়াল পরীক্ষার সময় বাঁ-পকেটে সিপাহী বিদ্রোহের কারণ আর ডান পকেটে আকবরের শাসন প্রণালী নিয়ে ইতিহাস পরীক্ষা দিতে গেছি। পরীক্ষায় দুটোই এসেছে। সবে বাঁ-পকেট থেকে কাগজটা বার করেছি, লক্ষ্য করিনি হেডস্যার বারান্দায় দাঁড়িয়ে। তারপর আমার বেল্ট দিয়ে আমাকে যা পেটালেন তা আর বলার না। এখনো অমাবস্যা, পূর্ণিমায় ব্যথা হয়। ডাক্তারবাবু আমাকে দয়া করুন। আমি বললাম, বেশ তাহলে সবার সামনে এক পা তুলে দাঁড়িয়ে থাকো। বিষ্টু বললো - আমার হাঁটুতে বাত। আমি বললাম, ফের বাজে কথা। বেশি কথা বললে দু-পা তুলে দাঁড়াতে বলবো। এই গোলমালের সুযোগে খুড়ো দোকানের পিছনের দরজা দিয়ে কেটে পড়ার তাল করছিলো। আমি চেঁচিয়ে বললাম, খুড়ো আমার মাথার পেছনে একটা চোখ আছে। তুমি ওখানে চুপটি করে দাঁড়াও। ভিড়ের মধ্যে থেকে একটা ছেলেকে বললাম, মোড়ের হলুদ বাড়ি থেকে পিন্টুকে ডেকে আন। বল আমি ডাকছি। পিন্টুকে বললাম, খুড়োর বাড়ির বাইরে যাওয়া একদম বন্ধ। বৌমাদের বলবি কড়া নজর রাখতে। আমি চলে আসছি। গণেশ বললো, ডাক্তারবাবু খুড়ো তো চলে গেলেন। এই রাজভোগটার কি হবে? আপনি বরং খেয়ে ফেলুন। আমি চোখ পাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, ঘুষ

দিচ্ছো? গণেশ বিনয়ে গলে গিয়ে বললো - ছি, ছি। কি যে বলেন। আমি বললাম, এই কুড়ি টাকা রাখো। তারপর রাজভোগটা খেয়ে এখানে এলাম।

(২)

আজ মাসের দ্বিতীয় রোববার। বরাট মাসে একবার লালুদাকে পরোটা আলুভাজা খাবার অনুমতি দিয়েছে। বৌদি আমাদের সকলকে তিনটে করে পরোটা ও আলুভাজা দিলেন আর বরাটের সামনে একটা ঝুড়িতে বেশ অনেকগুলি পরোটা রাখলেন। আমরা খাচ্ছি আর আড়চোখে গুনছি বরাট কটা খাচ্ছে। চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে বরাট উঠে পড়লো। লালুদা বললেন - আজ তো তোমার চেম্বার নেই। এত তাড়া কিসের? বরাট বললো - একবার দীপকবাবুর কাছে যাবো। ওঁর বাড়িতে অনেক যন্ত্রপাতি আছে। একটা স্লাইড ক্যালিপার দরকার। স্লাইড ক্যালিপার নিয়ে তুমি কি করবে - লালুদা জানতে চাইলেন। বরাট বললো - আমাদের পাড়ার সব দোকানের রসগোল্লার ডায়ামিটার মেপে রাখবো। এবার থেকে রসগোল্লা খেতে বললে প্রেসক্রিপশনে ডায়ামিটার লিখে দেবো। ওঃ, খুড়োর প্যাঁচটা একদম বুঝতে পারিনি। বরাট উঠে দাঁড়ালো। অমিত বললো - ডাক্তার কাকা, লালুদা এখন তো ভালো আছেন। মাসে দু-দিন পরোটা আলুভাজা খেলে হয় না। বরাট চোখ পাকিয়ে বললো - বেশি তেল লালুদার কাছে বিষ। আর মাসে দু-দিন হলে তোমাদের প্রসাদ পেতে সুবিধা হয় তাই না? পরোটা ভাজতে বৌদির কষ্ট না। যতো সব অপোগণ্ড। বরাট দরজা দিয়ে বের হয়ে গেল। বাবলু খুব আস্তে আস্তে বললো - আমরা পাঁচ জনে মিলে পনেরোটা পরোটা খেলাম আর ডাক্তারবাবু একাই বারোটা মেরে দিলো! সে বেলায় বৌদির একটুও কষ্ট হলো না।

(৩)

বরাট চলে যেতে লালুদা হো হো করে হাসতে লাগলেন। বললেন - পেট ফেটে হাসি আসছিলো। কিন্তু বরাটের ভয়ে হাসি আর বার হচ্ছিলো না। আহা বিষ্টুকে যদি সত্যি দু-পা তুলে দাঁড়াতে হতো! বাবলু বললো - লালুদা, আপনি তো এক সময় খুব খেতে পারতেন। লালুদা বললেন - সে দিন কি এরকম ছিলো? জায়গায় বসে সব পাওয়া যেতো? আমরা খাবার জন্য দল বেঁধে এখানে ওখানে যেতাম। বর্ধমানের সীতাভোগ মিহিদানা, শক্তিগড়ের ল্যাংচা, জনাই-এর মনহরা, মালদার আমসত্ত্ব, বহরমপুরের ছানাবড়া, সিউড়ির মোরব্বা, কৃষ্ণনগরের সরভাজা সরপুরিয়া, বনগাঁর কাঁচাগোল্লা, রানাঘাটের পানতুয়া এ-সবের স্বাদ একদম ভুলে গেছি। কলকাতায় এখন সব পাওয়া যায় - অমিত বললো। শক্তিগড়ের ল্যাংচার চেয়ে ভালো ল্যাংচা আমাদের শ্রীহরি বানায়। বরাটের পারমিশন এনে দিন, আপনাকে খাইয়ে দেবো। লালুদা বললেন - ওরে বাবা। তার চেয়ে সহজ আলিপুরে গিয়ে বাঘের খাঁচায় ঢুকে বাঘকে গুড মর্নিং করে আসা। দীপ বললো - শুনেছি আপনাদের ছোটোবেলায় কলকাতায় এতো মিষ্টির দোকান

ছিলো না। লালুদা বললেন - তার জন্য আমাকে বেশি দূর যেতে হতো না। আমি লেক মার্কেটের পিছনে থাকতাম। লেক মার্কেটের উল্টোদিকে মিষ্টিমুখ নামে একটা ভালো মিষ্টির দোকান ছিলো। মা মাঝে মাঝে এক দু-আনা দিতেন। তখন সস্তার দিন তাতে অনেক মিষ্টি পাওয়া যেতো। তাছাড়া বাজার করতে গেলে এক দু-আনা সরিয়ে রাখতাম। মিষ্টিমুখ দোকানে রবি ঠাকুরের ছবি দিয়ে একটা সার্টিফিকেট ছিলো -

"মিষ্টিমুখের মিষ্টান্ন পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম। তৃপ্তি লাভ করিয়াছি। ইহার বিশেষত্ব আছে। সে জন্য ইহা আদরণীয়। এই সঙ্গে যে দধি সেবন করিলাম তাহা বিশেষ প্রশংসার যোগ্য"।

ওখানে গেলে আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওটা পড়তাম। দোকানে যেতে যেতে দোকানের ম্যানেজার কাম ক্যাশিয়ার প্রতাপবাবুর সঙ্গে খুব ভাব হয়ে গিয়েছিলো। একদিন বললেন, লালু তোমাকে দেখি দোকানে এলে এই সার্টিফিকেট-টা খুব মন দিয়ে পড়ো। জানো এর সঙ্গে দুটো গল্প জুড়ে আছে। আমি বললাম - জানিনা তো। প্রতাপবাবু বললেন - রোববার বিকেলে আমি দোকানে বসি না। আমার বাড়িতে এসো। আমার বাড়িটা এখান থেকে সোজা কেওড়াতলার দিকে যাওয়ার বাঁকের দুটো বাড়ি আগে। চিনতে অসুবিধা হবে না। ছেলেদের বলেছি সময়কালে খাট লাগবে না। চ্যাংদোলা করে কেওড়াতলায় নিয়ে গেলেই হবে।

বৌদি ঘরে ঢুকলেন। ট্রে তে ছ-কাপ চা। আমাদের চা দিয়ে নিজে এক কাপ নিয়ে চেয়ারে বসে পড়ে বললেন - গল্পটা শুনেই যাই। লালুদা বলতে সুরু করলেন - প্রতাপবাবু ভালো গল্প বলতে পারতেন না। আমি আমার মতো করে গল্পটা বলছি। ধরে নাও আমি প্রতাপবাবু।

(৪)

আমাদের দোকানের মালিক সুবোধবাবুর বাবা সুধীরবাবুর ঢাকা শহরে খুব চালু মিষ্টির দোকান ছিল। সুবোধবাবু বাবার দোকানের কারিগরদের সঙ্গে বসে মিষ্টি বানানো শেখেন। সুধীরবাবুর ইচ্ছা ছিলো ছেলেকে ঢাকা শহরে একটা মিষ্টির দোকান করে দেবেন। কিন্তু সুবোধবাবু ঠিক করলেন কলকাতায় দোকান করবেন। তাই কলকাতায় চলে এসে এই লেক মার্কেটের উল্টোদিকে দোকান খুলে বসলেন। সুবোধবাবু মিষ্টি নিয়ে নানা রকম পরীক্ষা নিরীক্ষা করতেন এবং নতুন নতুন মিষ্টি তৈরি করার পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। এইসব মিষ্টি আমাদের দোকানে ছাড়া আর কোথাও পাওয়া যেতো না। তা সত্ত্বেও সুবোধবাবুর ব্যবসা আশানুরূপ ফুলে ফেঁপে উঠলো না। লোকসান হতো না ঠিকই, তবে লাভের পরিমাণ খুব বেশি ছিলো না। একদিন সুবোধবাবু কাগজে দেখলেন গুরুদেব কলকাতায় এসেছেন, সপ্তাহ দুয়েক জোড়াসাঁকোতে থাকবেন। এক রোববার সকালে আমাকে আর দোকানের এক কর্মচারীকে সঙ্গে করে সুবোধবাবু তাঁর আবিষ্কারের ফসল নিয়ে জোড়াসাঁকো হাজির হলেন। কবি মুখ তুলে বললেন,

কি চাই তোমার? সুবোধবাবু বললেন, আমার একটা মিষ্টির দোকান আছে। আমার আবিষ্কার করা কয়েকটা মিষ্টি আপনাকে খাওয়াবার জন্য নিয়ে এসেছি। কবির দেশীয় জিনিষের পরে বরাবর একটা অনুরাগ ছিলো। তিনি খুশি হয়ে বললেন - বেশ বেশ বার করো তোমার মিষ্টি আর বাড়ির সকলকে ডাকো। কবি একটা করে মিষ্টি ভেঙে একটু একটু করে খাচ্ছেন আর বলছেন, বাহ্, বাহ্, অতি উত্তম। সুবোধবাবু এবার হাত কচলাতে কচলাতে বললেন, গুরুদেব একটা সার্টিফিকেট যদি লিখে দেন তবে আমি তা দোকানে ঝুলিয়ে রাখতে পারি। কবি নিজের চেয়ার ছেড়ে উঠে কোনের টেবিলের সামনের চেয়ারে বসলেন। তারপর ঐ সার্টিফিকেট-টা লিখে দিলেন, যেটা তুমি দোকানে এলে মন দিয়ে পড়। তারপর থেকে সার্টিফিকেটের জন্য কিনা জানিনা সুবোধবাবুর সব প্রত্যাশা ছাড়িয়ে আমাদের দোকানের বিক্রি অস্বাভাবিক ভাবে বেড়ে গেল।

আমাদের দোকানে আর এক খদ্দের ছিলেন। তার নাম সাধন চন্দ্র পাকড়াশি। পাকড়াশির একটা ছোটোখাটো ব্যবসা ছিলো - সাবিত্রী স্মল স্কেল ইণ্ডাষ্ট্রিস। তার মাথায় একদিন ভুত চাপলো, দাড়ি কামাবার ব্লেড বানাবার। তখন আমরা বিলাতি ব্লেড ব্যবহার করতাম। যাইহোক পাকড়াশি ব্লেড বানিয়ে ফেললো। নাম দিলো মসৃণ ব্লেড। তারপর একদিন এক বড়ো প্যাকেট ব্লেড নিয়ে দুপুরের ট্রেনে সোজা বোলপুর হাজির হলো। রাতটা আত্মীয়ের বাড়ি কাটিয়ে সকাল হতে না হতে উত্তরায়ণে হাজির হলো। কবি তখন সবে এক গেলাস নিমপাতার রস শেষ করেছেন। তিনি পাকড়াশিকে জিজ্ঞাসা করলেন, এই সাত সকালে তুমি কে হে? পাকড়াশি নিজের পরিচয় দিয়ে বললো - আমি দেশীয় জিনিষ দিয়ে ব্লেড তৈরি করেছি। আপনাকে দেখাবার জন্য এনেছি। কবি গোল গোল চোখে পাকড়াশির দিকে তাকালেন। গোঁফের ফাঁক দিয়ে একটা পাতলা হাসির রেখা দেখা গেল। কবি এদিক ওদিক দেখলেন। টেবিলের উপর একটা কাঁচের গ্লাসে অনেকগুলি পেন্সিল ছিল। কবি তার থেকে একটা তুলে নিলেন। একটা ব্লেড বার করে কবি পাকড়াশির দিকে তাকালেন। ব্লেডটাকে তেরছা করে পেন্সিলের উপর বসিয়ে একটু চাপ দিলেন। পেন্সিল কাটলো না। কবি আর একবার চেষ্টা করলেন। ফল সেই একই। কবি এক মুহূর্ত কি ভাবলেন। ক্লিপবোর্ডটা টেনে নিয়ে টেবিল থেকে একটা কলম নিয়ে খাপটা খুললেন। আর একবার পাকড়াশির দিকে তাকিয়ে লিখতে সুরু করলেন -"মসৃণ ব্লেড অতি উত্তম। ইহাতে পেন্সিল বা গাল কোনোটাই কাটে না"। কবির গোঁফের আড়ালে পাতলা হাসিটা আরও স্পষ্ট হলো। পাকড়াশি উল্টোদিক থেকে লেখাটা পড়ছিলো। মসৃণ ব্লেড অতি উত্তম পর্যন্ত পড়ে তার গোঁফ ফুলে উঠলো। বাকিটা পড়ার আর ধৈর্য রইলো না। কবির হাত থেকে কাগজটা প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে নাচতে নাচতে বোলপুর স্টেশনে হাজির হলো। বৌদি জিজ্ঞাসা করলেন - এই সার্টিফিকেট পেয়ে ব্লেডের কি হলো? লালুদা বললেন, প্রতাপবাবু বলেছিলেন এরপর পাকড়াশির সঙ্গে বার দুয়েক দেখা হয়েছে। মনে হয় পাকড়াশি বাড়ি বদল করে অন্য কোথাও চলে যায়। আমাদের দোকানে আর দেখিনি। আর মসৃণ ব্লেড কখনও কোনো দোকানে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। বাবলু ফট করে প্রশ্ন করে বসলো - লালুদা,

আপনি তো খেলার মাঠের অনেক খবর রাখেন। আচ্ছা আপনি কি জানেন কবির খেলাধুলায় কি রকম উৎসাহ ছিল? লালুদা বললেন - আমাদের স্কুলের বাংলার মাস্টারমশাই ছাত্রাবস্থায় শান্তিনিকেতনে ফুটবল খেলতে গিয়েছিলেন। কবি মাঠে দর্শক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। ফুটবল খেলেছেন বলে শুনিনি। তবে শুনেছি একবার ইংল্যান্ডের ফাস্ট বোলার মরিস টেট শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন। কেন এসেছিলেন জানিনা। তার বিরুদ্ধে ব্যাট করতে কবি ব্যথা পেয়ে দু-ছত্র কবিতা লিখেছিলেন -

"টেটের ঐ অগ্নি গোলক
দিয়ে গেল মোরে মরণ দোলক"।

এটা গল্প কিনা জানিনা। কবি-জীবনীকার প্রশান্ত পাল মশাই বেঁচে থাকলে এর সত্যতা জানা যেতো।

November 2011